বুয়া সংকট

লিখেছেন **শাহিদুজ্জামান মাসুদ**

বাংলাদেশের নগর ও শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর দৈনন্দিন কাজের জন্য কাজের লোক বা কাজের বুয়া লাগেই। একান্নবর্তী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বড় শহরগুলোতে আসা অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করছেন। এরকম পরিবারগুলোতে একজন কাজের বুয়া অনিবার্য।

গ্রামাঞ্চলে ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে যাওয়া পরিবারগুলো থেকে কাজের সন্ধানে পুরুষেরা যেমন প্রতিদিন নগর-শহরে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে আসছে নারীরাও। এসব পরিবারের একটি অংশ আবার নদী ভাঙনের শিকার। নারীদের একটি বড় অংশ বাসায় একটা নির্দিষ্ট চুক্তিতে কাজ করে। কিন্তু তাদের জন্য শ্রমের বিপরীতে যে অর্থ দেওয়া হয়। তা একেবারেই অপ্রতুল। বিগত দশকে গার্মেন্টস শিল্পের উন্নতির ফলে দুই থেকে আট/দশ ক্লাস পড়া অনেক মেয়ে এই সেক্টরে যোগ দিয়েছে। সেখানেও শ্রমের বিনিময়ে যে বেতন পাওয়া যায় তা বুয়াদের বেতনের চেয়ে বেশি হলেও শ্রম এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা অনুপাতে নগণ্য। কিন্তু এই সেক্টরের বিকাশের ফলে নগর-শহরে কাজের বুয়াদের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বুয়ারাও এখন অনেক ক্ষেত্রে পূর্বমূল্যে শ্রম দিতে অনিচ্ছুক। পাশাপাশি বুয়াদের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে আচরণ করা হয়, তাতে তাদের দাসের অধিক ভাবা হয় না। বুয়া, দাস প্রথার ক্রমবিকশিত রূপ। দাসপ্রথা অনেক কালের পুরনো। ভারতীয় সমাজে দাস প্রথার মতো নিষ্ঠুর কিছু ছিল না। মহেঞ্জোদারোতে বৃহৎ গৃহ সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর বা খুপরিগুলো দাস জাতীয় লোকের জন্য নির্দিষ্ট ছিল বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা মার্শাল উল্লেখ করেছিলেন। রামায়ণে ধীবর দাসদের কথা উল্লেখ আছে। মহাভারতে দাসের পাঁচটি পর্যায় পাওয়া যায়।

পরিবারের দাস, ক্রীতদাস, যুদ্ধদাস, জুয়ার পণ, উপহার দাস। আবার ছয় প্রকার দাসের কথা বলা হয়েছে জৈনদের রচনায়। গর্ভদাস, ক্রীতদাস, ঋণদাস, দুর্ভিক্ষ দাস, অর্থদন্ড দাস, যুদ্ধদাস। কৌটিল্য, মনু ও নারদ ভারতীয় সমাজে, দাসদের কথা উল্লেখ করেছেন।

হকিন্স নামে এক ইংরেজ ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে গিনি উপকূল থেকে আফ্রিকানদের ধরে জলপথে ক্রীতদাস হিসেবে চালান দিতো। তার ক্রীতদাসের চালান যেত আমেরিকায়। ষোড়শ শতকে তিনি ২৫০০ ক্রীতদাস বিক্রি করে রেকর্ড করেছিলেন।

পর্তুগিজদের দিগ্বিজয়ের কথা সবারই জানা। এক সময় ভারতেও তাদের দাপট ছিল। ভারত থেকে তারা ইউরোপে যে সব ক্রীতদাস পাঠাত তারা খেতে-খঅমারে-খনিতে কাজ করত। এসব দাস সড়ক ও শহর নির্মাণে শ্রম দিত। পর্তুগিজদের দাস ব্যবসা পর্তুগালের রাজ অনুমোদিত ছিল। এমনকি তৎকালীন পর্তুগিজ লেখকরা একে সমর্থন করে লেখেন, 'ইহাতে দোষের কিছু নাই, ক্রীতদাসেরা খ্রিস্টান ধর্মের আশ্রয়ে থাকিয়া সুসমাচার লাভ করিবে, এই লাভের তুলনায় স্বাধীনতা হারানোর ক্ষতি বেশি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।'

কিন্তু এ বিষয়ে তথাকথিত সুসভ্য ইংরেজরাও পিছিয়ে ছিল না। ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী অন্যান্য ইংরেজ উপনিবেশে তখন দাস-দাসীর ব্যাপক চাহিদা ছিল। 'মানুষ রপ্তানির সুবিধার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে এক নতুন আইন জারি করেন। এই আইনে ঘোষিত হয় যে, 'ডাকাতির অভিযোগে কোনো ব্যক্তির প্রাণদন্ড হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের সমস্ত লোককে ক্রীতদাস পর্যায়ভুক্ত করা হইবে।'

ড. অতুলপ্রসাদ তার 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন 'শুধুমাত্র মুসলমান বা খ্রীস্টান সমাজই নয়, হিন্দু সমাজেও দাস-দাসী রাখা হতো।' হিন্দু সমাজে দাস-দাসী কেনা ও রাখা যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত ছিল তা নয়, সম্পন্ন চাষাভুষার ঘরেও দাস দাসী থাকত।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আগের অর্থাৎ ১০০/১৫০ বছর আগে বা তারও আগের দাসপ্রথা এখনো বর্তমান। তবে, নতুন মোড়কে। তখনকার মতো দাস-দাসী কেনাবেচা এখন হয় না অবশ্য। অর্থের বিনিময়ে সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের জন্য নিয়োগ করা হয় গৃহপরিচারক বা পরিচারিকা। গ্রামাঞ্চলে অল্প হলেও শহরের প্রায় প্রতিটি বাসায় বুয়া বা গৃহপরিচারিকার প্রয়োজন। এছাড়া বিভিন্ন ব্যাচেলর কোয়ার্টার বা মেসের খাবার-দাবারের আয়োজন, ঝাড়া-মোছা, কাপড় কাচার বিষয়গুলো এখন অনেকটাই কাজের বুয়ার ওপর নির্ভরশীল।

মানুষ তার ক্ষুধা মেটানোর জন্য সমাজের ওপর স্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পেশায় জড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ নানা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়, আবার একই তাড়নায় কেউ কাজ করে তার সহযোগী হিসেবে। উদ্দেশ্য এক হলেও লক্ষ্য থাকে ভিন্ন। কারো আয় থেকে উদ্বৃত্ত থাকে, কেউ হয়ে পড়ে ঋণগ্রস্ত। বুয়া বা কাজের লোক কাজ করে নিজের বা পরিবারের অন্য সদস্যদের দু'বেলা ডাল-

ভাতের জন্য। নানা অপমান ও বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও কাজ করে যায় তারা নিরলসভাবে।

বুয়া : পরিবারের অনিবার্য সদস্য

প্রতিটি মানুষই চায় একটু আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করতে। অর্থের দিক থেকে একেবারে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের কথা বাদ দিলে নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সব পরিবারে প্রয়োজন হয় একজন কাজের লোক। সংসারের কাজ থেকে শুরু করে বাসা-বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, কাপড় ধোয়া, টুকিটাকি ফরমায়েশ খাটাতে প্রয়োজন হয় একজন বুয়া বা গৃহপরিচারিকার। রান্না করা এবং সংসারের অন্যান্য কাজের জন্য মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তদের বুয়া লাগেই। এসব পরিবারের বাচ্চাদের স্কুলে রেখে আসা এবং নিয়ে আসার জন্যও প্রয়োজন হয় বুয়ার।

মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি পরিবারের মেয়েরা এখন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। চাকরি-বাকরির দরুন দিনের প্রায় পুরোটাই বাসার বাইরে থাকতে হয় তাদের। নজর দিতে পারে না সারা দিন সংসারের বিভিন্ন কাজে। তার অনুপস্থিতিতে প্রয়োজন হয় একজন গৃহপরিচারিকার। সে-ই সংসারের যাবতীয় কাজ করে থাকে।

সামাজিক জীবনে শিক্ষিত মেয়েদের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। শিক্ষিত নারীর কাজের পরিধি এখন গৃহ থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাদের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য বা তাদের বাসায় কাজ করার জন্য প্রয়োজন হয় একজন বুয়া বা গৃহপরিচারিকার। যেসব বাসা-বাড়ির মেয়েরা শিক্ষিত হয়েও চাকরি করেন না বা অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত নন, সেসব বাসায়ও সংসারের টুকিটাকি কাজের জন্য প্রয়োজন হয় একজন বুয়া বা গৃহপরিচারিকার। আজ বাসা-বাড়ি, মেস-কোয়ার্টার, চায়ের স্টল, ছোট-বড় প্রায় সব হোটেলে বুয়ারা কাজ করে।

রাজধানীতে বুয়ার অভাব

রাজধানীতে বুয়া পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। স্বামী ও স্ত্রী উভয় চাকরিজীবী পরিবারে একজন বুয়া পেতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বুয়া কমে যাওয়ার নেপথ্যে রয়েছে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ। গ্রাম থেকে আসা দরিদ্র মেয়েরা এখন বাসায় নয়, গার্মেন্টসে কাজ করতে পছন্দ করে। কারণ বাসা থেকে গার্মেন্টসে কাজ অধিক কষ্ট হলেও স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা থাকে বেশি। এছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমেই চাঙ্গা হয়ে উঠছে। মেয়েরা এনজিও থেকে সহজে ঋণ পাচ্ছে। এ ঋণ তারা ছোট ব্যবসায় খাটিয়ে বেশ লাভবান হচ্ছে। ফলে ছিন্নমূল নারীদের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমছে। বুয়াদের ওপর পারিবারিক নির্যাতন ও অসম্মান প্রদর্শনের ভয়ে অনেক দরিদ্র নারী গৃহপরিচারিকার কাজ করতে চায় না। ন্যূনতম অন্য কাজ পেলেই বাসার কাজ ছেড়ে দেয়।

বুয়াদের মুখোমুখি

এ প্রতিবেদক কয়েকজন বুয়ার মুখোমুখি হলে জানতে পারে তাদের বিচিত্র জীবন সম্পর্কে। শেফালী বেগম। বাড়ি মানিকগঞ্জ। বুয়া বা ঝিয়ের কাজ করে। আগে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো। মাসে প্রায় ২০ দিনই রাতে কাজ করতে হতো। এছাড়া দিনের কাজও আছে। ফ্যাক্টরিতে বসার সময় দিতো খুব কম। শরীরের ওপর খুব চাপ পড়তো। তাই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কাজ ছেড়ে দিয়ে বাসাবাড়িতে কাজ করছি।

বাসাবাড়িতে তিনটা বা চারটা কাজের হিসাব করে কাজে নিতো শেফালী বেগমকে। কিন্তু কাজ করতে গেলে দেখা যেতো অন্য কাজও করতে হয়। কাজের আর শেষ থাকে না। এছাড়া একটা কাজ ভালোভাবে করলেও অনেক সময় দু'তিনবার পর্যন্ত সেই একই কাজ করতে হতো। তাই এক বাসায় কাজ করে এসে অন্য বাসায় কাজ করতে পারতাম না। অনেক সময় নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে কাজে যাওয়া লাগতো। আর যারা কাজ করাতো তারা তো আর আমার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকবে না। হয়তো দু' একদিন দেখে নিষেধ করে দেয় কাজে আসার জন্য। এখন একটি বাসায় যে টাকা পাওয়া যায় তা তো সামান্য। ফলে একাধিক বাসায় কাজের জন্য উদয়াস্ত খাটতে হয়।

শেফালী বলেন, এখন আমি কাজ করি মেস, কোয়ার্টারে। এখানে কাজ করলে মোটামুটি সুবিধা পাওয়া যায়। তিন/চারটা মেসে একসঙ্গে কাজ করলে ১৫০০/১৬০০ টাকা রোজগার করা যায়। তাছাড়া দুপুর ও রাতের খাবার খাওয়া যায়। আমি মিরপুরের মধ্য পাইকপাড়ায় কাজ করি। এখানেও বেশিদিন কাজ করবো না। এ কাজে সমাজে মাথা উঁচু করে চলা যায় না। সবাই বুয়া হিসেবেই দেখে। আমাদেরও তো মান-সম্মান আছে। এটা কেউ বুঝতেই চায় না।

জামালের মা মরিয়ম বেগম বাড়ি কুমিল্লার লাকসামে। তিনি বলেন, বাসায় বুয়ার কাজ করি। আগেও বাসায় কাজ করতাম। বাসাবাড়িতে কাজ করতে ভালোই লাগে। কোনো অসুবিধা হয় না। আমি মোহাম্মদপুর বস্তিতে এক ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। কাজ করি তাজমহল রোড়ে। স্বামী আছে, একটি ছেলেও আছে। ছোট ছেলে বস্তির ঘরেই থাকে। পাশের ঘরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করে। কোনো অসুবিধা হয় না। স্বামী রিকশা চালায়। দু'জনের রোজগারে ভালোই চলে সংসার। তবে মান-সম্মান নাই এ কাজে। সবার কথা শুনতে হয়। কেউ কেউ মানুষই মনে করে না আমাদের। বছরে একবারের বেশি গ্রামের বাড়ি যেতে পারি না। আর বুয়ার কাজও করতে ভালো লাগে না। অল্প দিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরে যাবো।

আলেয়া বানু। কাজ করে যাত্রাবাড়ীর ১৮৭/২ নং বাসায়। নিজের বাড়ি গফরগাঁও। তিনি বলেন, দুটা বাসায় কাজ করি, মাসে ৭০০/৮০০ টাকা রোজগার হয়। স্বামীসহ দুই মেয়েকে নিয়ে যাত্রাবাড়ীর এক বস্তিতে থাকি।

সংসারের খারাপ অবস্থার জন্যই বাধ্য হয়ে আলেয়া বানু কাজ করছে। স্বামীর রোজগার এবং নিজের রোজগারে টানাটানিতে সংসার চলে। দীর্ঘদিন কাজ করার ইচ্ছা আছে তার।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজের ব্যাপক সুযোগ থাকায় গ্রাম থেকে আসা মেয়েরা আর বাসাবাড়িতে কাজ করতে চায় না। এখন বস্তিতে পর্যন্ত টেলিভিশন, ডিশের চ্যানেলগুলো দেখার সুযোগ আছে। বিভিন্ন ছবি, নাটক, সিরিয়াল কাজের বুয়াদের মধ্যে এক ধরনের সম্মান ও সম্ভ্রমবোধের জন্ম দিচ্ছে। ফলে অনেক বাসায় বাজে ব্যবহারের উত্তরে কথা বলে তারা চাকরি খোয়াচ্ছে আর কাজে আগ্রহ হারাচ্ছে।

বুয়া : মানবিক আচরণ করতে হবে

বুয়া বা গৃহপরিচারিকার চাহিদা আমাদের নাগরিক জীবনে উত্তরোত্তর বাড়ছে। কিন্তু সেই তুলনায় বুয়া বা গৃহপরিচারিকা পাওয়া যাচ্ছে না। আর গ্রাম থেকে যারা আসছে তারা মোটামুটি লক্ষ্যস্থির করেই আসছে ঢাকা শহরে। তাই আমরা যারা শহরে থাকি তাদেরকে আরো সদয় ও নমনীয় হতে হবে বুয়াদের প্রতি, তাদের কাজের প্রতি। বুয়াদের যদি ন্যূনতম সম্মান দিয়ে কাজ করানো যায় এবং কাজের মূল্যায়ন করে যথাযথ পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে কাজের বুয়ার সংকট কমবে। এরকম পরিবেশ তৈরি হলে তারাও উৎসাহিত হবে বিভিন্ন বাসাবাড়িতে কাজ করতে। শ্রম দিতে।